ASIAN HUMAN RIGHTS COMMISSION
19 Floor, Go-Up Commercial Building, 998 Canton Road
Kowloon, Hong Kong . Tel: +(852) 2698-6339 . Fax: +(852) 2698-6367
E-mail: ahrchk@ahrchk.org . Web: www.ahrchk.net

অতি সত্ত্বর প্রকাশের জন্য
৩ আগষ্ট ২০০৬
এএইচআরসি-ওএল-০৩৮-২০০৬

জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের প্রতি এশিয়ান হিউম্যান রাইটস্ কমিশনের খোলা চিঠি

লুইস আলফোনসো ডি আল্বা
সভাপতি
জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল
ওএইচসিএইচআর-ইউএনওজি
৮-১৪ এভেনিউ ডি লা পাইক্স
১২১১ জেনেভা ১০
সুইজারল্যান্ড

ফ্যাক্স: +৪১ ২২ ৯১৭৯০১২

প্রিয় জনাব ডি আল্বা,

বাংলাদেশ: বিচার বিভাগ ও নির্বাহী পৃথকীকরণে ব্যর্থতা বাংলাদেশকে জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের জন্য অনুপযুক্ত করে তুলছে

এটা হচ্ছে পাঁচটি চিঠির প্রথম চিঠি যা এশিয়ান হিউম্যান রাইটস্ কমিশন (এএইচআরসি) বাংলাদেশের ভয়াবহ মানবাধিকার পরিস্থিতি এবং এর কারণসমূহের বিষয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে আপনার মাধ্যমে জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলকে লিখতে বাধ্য হচ্ছে। আমরা এটা করছি, যদি বাংলাদেশ সদস্য হিসেবে আসন্ন তিন বছরের জন্য থাকার অনুমতি পায় যেমনটা তারা চেয়েছে, এবং যেহেতু কাউন্সিলের মর্যাদা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন, সে কারনে।

এই প্রথম চিঠিতে আমরা আলোকপাত করতে চাই কাউন্সিলকে উদ্দেশ্য করে বাংলাদেশ সরকারের করা সতেরটি স্বেচ্ছা-অঙ্গীকার বিষয়ে যেটা "যথা শীঘ্র সম্ভব বিচার বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগ পৃথক করা"র প্রতিশ্রুতিসহ ১৩ এপ্রিল ২০০৬ তারিখে তার অঙ্গীকারনামার (aide memoire) অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বাংলাদেশ সরকার এই অঙ্গীকার করাটা প্রয়োজনীয় মনে করেছিল যেহেতু উর্ধত্বন বিচার বিভাগ ছাড়া বাংলাদেশের বিচারকরা প্রকৃত অর্থে মামুলি আমলা। না জেলা আদালতে, না ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে কাউকে পাওয়া যাবে, যিনি প্রকৃত অর্থে 'বিচারক' হিসেবে অভিহিত হতে পারেন। একই ব্যক্তি সকালে একজন কর সংগ্রাহকের কাজ করবেন, বিকেলে ম্যাজিষ্ট্রেট হিসেবে, এবং সন্ধ্যায় হয়ত তাকেই কোন সরকারী সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করতে হবে যার দায়িত্বে তিনি নিয়োজিত। আদালতগুলো তিন বা চারটি মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত এবং এই তথা কথিত ম্যাজিষ্ট্রেটদেরকে এগুলোর সবদিকেই খেয়াল রাখতে হয়।

কার্যক্রমের এই হ-য-ব-র-ল অবস্থা বাংলাদেশকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। এটা মানবাধিকার অপব্যবহারের শিকার ভিক্টিমদের প্রতিকার পাওয়ার সকল সম্ভাবনাগুলোকে অস্বীকার করে এবং অভিযুক্ত নির্যাতনকারীদেরকে দায়মুক্তির গ্যারান্টি দিয়ে চলেছে। যখনই যে রাজনৈতিক দল ক্ষমতাসীন হয় ম্যাজিষ্ট্রেট এবং জেলা জজদেরকে তাদের এজেন্টদের চেয়ে সামান্য অগ্রগামী হয়ে সম্পূর্নরূপে আপোষ করতে হয়, তা- সে অপরাধী পুলিশ হোক, আর অপর কোন সরকারী কর্মকর্তাই হোক।

যেহেতু সকল অপরাধ সংক্রান্ত মামলাগুলো প্রথমেই ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের মাধ্যমে শুরু হয়, তাদেরকেও তেমনি কাজ করতে হয় অসংখ্য বাঁধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে অগণিত আইনসিদ্ধ অপব্যবহারের অভিযোগ নিয়ে। এমনকি, এমন মামলার কথাও শোনা যাবে, এবং বেশকিছু উদাহরণও এমন রয়েছে যেখানে বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশের পরও পরিশেষে ফলাফল দাঁড়ায় শুন্য।

ধরুন শাহীন সুলতানা শান্তা'র মামলাটির কথা। অন্তঃসত্তা একজন নারী যিনি ১২ মার্চ ২০০৬ তারিখে ঢাকায় পুলিশের দ্বারা বর্বরভাবে নির্যাতিত হয়ে গর্ভের সন্তানটিকে হারিয়েছেন। অভিযোগের পর ম্যাজিস্ট্রেট একটি তদন্ত কমিটি গঠনের আদেশ দিলেন। যেখানে প্রমাণও পাওয়া গেল যে, পুলিশ অপরাধ করেছে। কিন্তু, ম্যাজিস্ট্রেট, অবশ্যম্ভাবীরূপে সরকারের বিভিন্ন তরফের চাপের মুখে কাজ করতে গিয়ে সিদ্ধান্ত দিলেন যে, যেহেতু কয়েকটি অভিযোগের স্বপক্ষে যথেষ্ট সাক্ষ্য মেলেনি সেজন্য, পুরো অভিযোগটিই খারিজ করা অর্থাৎ ছুঁড়ে ফেলতে হবে। শান্তা বর্তমানে হাইকোর্টে একটি রীট আবেদন পেশ করেছেন। কোন প্রতিকার পাওয়া যাবে না জেনেই অন্য অনেকের মত তিনি আর জেলা পর্যায়ের আদালতে রিভিউ মামলা দায়েরের কথা ভাবেন নি। অন্য অনেকের চেয়ে ব্যতিক্রমী হওয়ায় তিনি সক্ষম হয়েছেন উচ্চতর আদালতের স্মরনাপন্ন হওয়ার, এই আশায় যে, অন্ততঃ সেখান থেকে কিছুটা প্রতিকার পাওয়া যেতে পারে।

জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের আসন লাভের উদ্দেশ্যে দাখিলকৃত অঙ্গীকারনামায় বাংলাদেশ সরকার উল্লেখ করেছে যে, "বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথকীকরণ বর্তমানে সক্রিয় প্রক্রিয়াধীন"। এর মানে কি? "যথা শীঘ্র সম্ভব" বলতে কখন? কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ হয়ত অবগত নাও হয়ে থাকবেন যে, কথিত প্রক্রিয়া বিগত ১৫ বছর যাবত "সক্রিয়"ই রয়েছে। নয় বছর সামরিক শাসনের কবল থেকে দেশটি বেরিয়ে আসার পর ১৯৯১ সালে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করার অঙ্গীকার করেছিল। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে প্রায় সকল প্রধান রাজনৈতিক দল ঐ একই ওয়াদা করেছিল। কিন্তু, আওয়ামী লীগ, যারা নির্বাচনে জিতল, পাঁচ বছর সময়কালেও সে ওয়াদা বাস্তবায়নের প্রয়োজন মনে করেনি। এমনকি, এটাকে কার্যে পরিণত করতে ১৯৯৯ সালে সুপ্রিম কোর্ট একটি আদেশ জারী করার পরও এমনটা ঘটলো। একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ২০০১ সালে কাজ আরম্ভ করেছিল। কিন্তু, নির্বাচিত সরকারের জন্য কাজটি রেখে যাওয়ার জন্য তাদেরকে অনুরোধ করা হয়েছিল। রাজনীতির চক্র বিএনপিকে আবারও ক্ষমতায় ফিরিয়ে নিয়ে এলো; সরকারের অন্যান্য অংশ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করার শক্তিশালী অঙ্গীকার এবারও ছিল। বলাই বাহুল্য, তাদের পাঁচ বছর প্রায় শেষের পথে এবং প্রকৃত অর্থে কোন অগ্রগতি এখনও হয়নি। বস্তুতঃ এই প্রশাসনটি পূনর্গঠন প্রক্রিয়া প্রতিহত করার সব ধরণের কাজই করেছে; সুপ্রিম কোর্টের রুলিং -এর জবাবে ২৩টিরও অধিক বার সময় বাঁড়ানোর ঘটনা ঘটেছে। ২০০৫ সালে আদালত চুড়ান্তভাবে ধৈর্য্যচ্যুত হয়ে জানিয়ে দেয় যে, কোন ক্রমেই আর সময় দেওয়া যাবে না। প্রকৃত অর্থে যা দেখা যাচ্ছে তার অর্থ আসলে কি দাঁড়ালো; যাইহোক, এ সংক্রান্ত আদালত অবমাননার মামলাটি এখন বিচারাধীন।

বিচার বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগের পৃথকীকাণের কার্যকারিতা একটি কার্যকর তদন্ত বিভাগের কার্যক্রমের উপরও নির্ভরশীল। দূর্ভাগ্যজনকভাবে, বাংলাদেশ সরকার তার অঙ্গীকারনামায় এই বিষয়টিকে কখনও কোনভাবেই উল্লেখ করেনি। বর্তমানে দেশব্যাপী প্রসিকিউটরদের পদ প্রতি বারেই রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সাথে সাথেই পরিবর্তিত হয়। রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগলাভ করা এসব প্রসিকিউটরদের অনেকেই অযোগ্য, বা আরোও নিম্নমানের, চতুর অপপ্রয়োগকারী। যতক্ষণ না নিয়োজিতদের বিষয়ে রাজনৈতিক অপপ্রয়োগ রোধকল্পে তদন্ত বিভাগটি পূনর্গঠিত হচ্ছে ততক্ষণ স্বাধীন বিচার বিভাগ নিয়ে আলোচনা যতই হোক না কেন তা হবে সামান্যই মূল্যবান।

বিচার বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগ পৃথকীকরণে বাংলাদেশ সরকারের অঙ্গীকার আদৌ কোন অর্থ বহন করে কি-না সে ব্যাপারে এএইচআরসি প্রচন্ডভাবে সন্দিহান। সত্যিকার অর্থেই যদি সরকার এই অঙ্গীকারের প্রতি গুরুত্ব দিত, তাহলে তারা কয়েক বছর আগেই কাজ শুরু করত, এবং এতদিনে বাংলাদেশের সর্বত্র স্বাধীন বিচার-আদালত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো সম্পন্ন হওয়ার পথ নির্মিত হত। দূর্ভাগ্যজনকভাবে, শাহীন সুলতানা শান্তার মত অগণিত সংখ্যক ভিক্টিমদের আজ আবধি দেশের তথাকথিত ম্যাজিস্ট্রেটদের বিস্তর অবিচার ও অপপ্রয়োগের ভোগান্তি বয়ে বেড়াতে হত না। ঐসব মানুষদের জন্য "যথা শীঘ্র সম্ভব" কথাটি কখনই যথেষ্ট শীঘ্র বলে প্রতিয়মান তো হয়ই না; অগণিত মানুষের জন্য এটা ইতোমধ্যে বড় বেশী বিলম্বই বটে।

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের নিকট প্রদত্ত পঞ্চম অঙ্গীকারটি হলঃ "কাউন্সিলের মেয়াদকালে সর্বজনীন মেয়াদী পর্যালোচনা প্রক্রিয়া (ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউ মেকানিজম) এর অধীনে পর্যালোচনা (রিভিউ)'র মুখোমুখী হতে সদা প্রস্তুত থাকা"। এশিয়ান হিউম্যান রাইটস্ কমিশন এখন কাউন্সিলকে উক্ত অঙ্গীকারটি স্মরণ করতে এবং কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থা পর্যালোচনার জন্য যত শীঘ্র তা করা যায়, করতে আহ্বান জানাচ্ছে। নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথকীকরণের ওয়াদা পালনে সরকারের ব্যর্থতা বাস্তবিক অর্থে এক অপরিমেয় ব্যর্থতা। এটা প্রতিদিনই বাংলাদেশের মানুষের দূর্ভোগ সৃষ্টি করছে এবং দেশের প্রশাসন ও ন্যায় বিচারের প্রতি তাদের আস্থা সর্বোতভাবে বিনষ্ট করছে। সব ধরণের মানবাধিকারের প্রতি মর্যাদা প্রকাশের সম্ভাবনাকেও অস্বীকার করছে। এটা কোন রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না, যারা বিশ্ব সম্প্রদায়ের ২১ শতকের মানবাধিকারের জন্য এক নতুন সংগ্রামের সহযাত্রী হতে চায়। বরং, এটা একটি আদিম সমাজ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য, যারা নিজেরাই এখনও পর্যন্ত ক্ষমতা ও সন্ত্রাসের সামন্ততান্ত্রিক মতবাদের বাইরে আসতে অক্ষম।

আমি অনুরোধ করবো যে, আপনার দপ্তর এই চিঠিকে কাউন্সিলের সকল সদস্যদের বিবেচনার জন্য পৌছে দেয়া হোক।

আপনার বিশ্বস্ত

বাসিল ফার্নান্ডো
নির্বাহী পরিচালক
এশিয়ান হিউম্যান রাইটস্ কমিশন, হংকং।

অনুলিপিঃ
১। জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের সকল সদস্য রাষ্ট্রের স্থায়ী প্রতিনিধিবৃন্দ, জেনেভা।
২। জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের সকল সদস্য রাষ্ট্রের দূতাবাসসমূহ, বাংলাদেশ।